Vol. 24 | No. 1 | 1980

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশের কবিতায় অস্তিত্বচেতনার স্বরূপ

Volume	24
Issue	1
Year	1980
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আজীজুল হক
Published online	December 1, 1980
DOI	10.62328/sp.v24i1.2
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v24i1.2
Pages	23-35
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশের কবিতায় অস্তিত্বচেতনার স্বরূপ

আজীজুল হক

অস্তিত্বের অভীষ্ট ও কবিতার ভূমিকা

কবিতা মানুষের অস্তিত্বসচেতন সামাজিক প্রয়োজনবোধ অতিক্রান্ত, সময়, ভূগোল ও চরিত্রনিরপেক্ষ কোনো এক শৈল্পিক মুক্তি, এবং কবিতা উপায় নয়, কেবল পরিণাম, এমন উচাঙ্গের সংস্কারকে একটা সংশয়হীন বিশ্বাসের মতো আমরা অনেকে লালন করি। অথচ কুসুম বৃক্ষ-জীবনের শৈল্পিক মুক্তি বা পরিণামসীমা নয়, তার অস্তিত্ববিষয়ক প্রয়োজনসিদ্ধিরও উপায়। প্রয়োজনসিদ্ধির মাপকাঠিতে বিচার করলে এ সত্যকে গোপন রাখা যায় না যে, রাজশিরে শোভিত কারুকার্যময় সোনার মুকুট থেকে কেবল শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য ও সৌন্দর্যমুগ্ধতা নয়, একই সঙ্গে রাজপ্রতাপও বিকীর্ণ হয়। রাজদরবারের দেয়ালে দোদুল্যমান হীরকখচিত সোনার তলোয়ার ব্যবহারিক গুণশূন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত একটি উপভোগ্য নিরীহ শিল্পকর্ম বটে, কিন্তু দেয়ালে তার ঝুলন্ত অস্তিত্ব রাজ-হুমকির প্রতীক। অবশ্য আমরা স্বীকার করতে বাধ্য যে, কবিতা যাদুঘরবিতৃষ্ণ এমনি এক যাদু, যা মন্ত্রতড়িৎ সঞ্চালনে রূপময় রাজদণ্ড, মানদণ্ড এবং পোষমানা ময়ূরের স্বর্ণদণ্ডকে পারস্পরিক রূপান্তরণের সম্মোহন-ক্রীড়ার উপযুক্ত। কবিতার যাদুকরী শক্তিতে আমরা বিশ্বাস করি, কেননা সম্মোহিত হবার জন্য আমরা প্রস্তুত থাকি; এবং প্রস্তুতির এই অতিমনস্কতা সুকৌশলে ব্যবহারযোগ্য এই যাদুর উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা সম্পর্কে আমাদেরকে সচেতন হতে দেয় না।

অভীষ্টসিদ্ধিতে ব্যবহৃত হলেও শিল্পীর ব্যক্তি-প্রতিভা অবশ্যই স্বীকারযোগ্য। কারণ, সম্রাটের সিংহাসনে, তলোয়ারে, সোনার মুকুটে, প্রাসাদের দেয়ালে-স্তম্ভে, রানীর কনকদর্পণে, কঙ্কনে ও কাঁচুলিনক্সায়, কিংবা সম্রাটের ঐশ্বরিক মহিমা কীর্তন-গাঁথায়, শিল্পী-কবিরা যে চূড়ান্ত কল্পনা-প্রতিভাবলে ও শিল্পনৈপুণ্যে বস্তুজগৎ ও মনোজগতের উপাদানসমূহ অপূর্বতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন, তা বিস্ময়কর। স্বাধীনতা না পেলে কল্পনা-প্রতিভার এই গগনচুম্বন সম্ভব হলো কী করে? তবে তাদের এই প্রতিভার স্বীকৃতি ও স্বাধীনতা অন্ততঃ দুটি শর্তের বিনিময়েই লভ্য ছিল। এক. কোনো প্রতিভাই অহঙ্কৃত গগনচুম্বী রাজমহিমাকে ভূতলশয়নে আকর্ষণ করতে পারবে না। দুই. নিম্নান্ত বা চূড়ান্ত সকল শিল্পকর্মেই রাজার শক্তি, দম্ভ, ঐশ্বর্য এবং একান্ত রাজকীয় ভোগ-বিলাসের সামর্থ্য ও রুচিকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলতে হবে। শিল্পকাব্য উপায় হিসেবে এভাবে প্রযুক্ত হয়েছে ও হচ্ছে, এভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিকাশ-পরিণাম লাভ করেছে ও করছে; কারণ, এমন পরিণাম লাভের জন্যই সে উদ্ভাবিত হয়েছে। রাজতন্ত্র, সামন্ত-তন্ত্র, ধনতন্ত্র, শ্রেণী যে-নামেই তার খোলস বদলাক না কেন, শিল্প কখনো অস্তিত্ব-সজ্ঞান প্রয়োজনবোধের শর্তসমূহ থেকে মুক্তিলাভ করেনি, করা তার পক্ষে সম্ভবও নয়। কেবল এটুকু স্মরণে রাখলেই সত্যের নিকটতম সান্নিধ্যে যাওয়া যায় যে, খণ্ডিত সমাজে এই প্রয়োজনবোধও খণ্ডিত, এবং একই সঙ্গে দ্বন্দ্বমুখর।

কবিতা এই দ্বন্দ্বমুখর সমাজ-জীবনভাবনা ও অস্তিত্বের প্রয়োজনবোধ থেকে মুক্ত হয়ে কেবল নির্দ্বন্দ্ব শিল্পভাবনায় ও খেয়ালী অপ্রয়োজনবোধে আক্রান্ত হতে ভালো-বাসে, এমন ধারণা আত্মপ্রতারণামূলক ও ভ্রান্তিবহুল, এবং এ ভ্রান্তি অদ্যাবধি অপ্রবল নয়। আমরা যারা এই প্রবলতার আশ্রয়ে লালিত হতে ইচ্ছা করি, তারা বিশ্বাস করতে ভালোবাসি যে, কবিতা দ্বান্দ্বিক জীবনজ্ঞানকে, ভাষা বা কথনকর্ম বক্তব্য বা কথিত বিষয়কে, শব্দ ভাব-অর্থসত্যকে, অথবা, কবিতার বিবর্তন সমাজ-বিবর্তনকে অতিক্রমণের নামে এসবকে অগ্রাহ্য করে যতো বেশিদূর চলে যেতে পারে, কবিসত্তার স্বাধীন বিহার ও কাব্যদিগন্তের সম্প্রসারণ ততো বেশি সংঘঠিত হয়। কারণ, এই মহৎ লোভনীয় ধারণায় আমরা অবিচল থাকতে চাই যে, শিল্পীসত্তার চূড়ান্ত বিকাশের জন্য জীবনের অস্তিত্বকেন্দ্রিক বস্তুনিষ্ঠ বিষয় ও অবস্থানিষ্ঠ বক্তব্য থেকে শর্তহীন স্বাধীনতা প্রয়োজন। মানবচৈতন্য বস্তুজগৎ-নিরপেক্ষ, এই তত্ত্বের সঙ্গে, মানুষের বাস্তব সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ, প্রতিবেশ, এবং সমাজবিবর্তনের নিয়ামক শক্তি-প্রবাহের স্বীকৃতি, আনুগত্য ও আনুকূল্যদান শিল্পীপ্রতিভার অবাধ স্বাধীনতায় বাধা জন্মায়, এই বিশ্বাসের নিকট আত্মীয়তা আছে। শর্তহীন স্বাধীনতার অপর নাম স্বেচ্ছাচারিতা এ সিদ্ধান্ত বাতিল হয়নি যখন, তখন ধরে নেয়া যেতে পারে যে, মানুষের সামাজিক অস্তিত্বকেন্দ্রিক প্রয়োজনবোধ শিল্পক্রিয়াকলাপকে ততোখানি মাত্র স্বাধীনতা দিতে পারে, যতোখানি দিলে তাকে স্বেচ্ছাচারিতার দায়ভাগী হতে হয় না। কিন্তু সামাজিক প্রয়োজনবোধ, দায়িত্ব, স্বাধীনতা স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদি শব্দলগ্ন প্রসঙ্গগুলো খণ্ডিত সমাজে তাৎপর্যবিভ্রান্তি ঘটিয়ে থাকে। এমন সমাজে সুবিধাভোগী প্রবল শ্রেণী প্রয়োজন, কর্তব্য, দায়িত্ব ইত্যাদি বলতে সমাজে তার নিজের সর্বাত্মক স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার বিষয় বলে, এবং সেই স্বার্থের সম্প্রসারণকল্পে যে-কোনো প্রকার স্বেচ্ছাচারিতাকেই অধিকার ও স্বাধীনতা বলে মনে করে। এমন শ্রেণীর বা এমন শ্রেণীতে লালিত বা লালনপ্রত্যাশী কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীরাও এমন স্বাধীনতার আস্বাদ পেতে পারেন। তবে তাঁদের রহস্যময় সৃজনশীল প্রতিভার স্বীকৃতি ও স্তুতি ততোদিন পর্যন্ত প্রলম্বিত থাকে, যতোদিন পর্যন্ত তাঁরা শ্রেণীর উৎসাহে শ্রেণীরই অনুকূলে বিশুদ্ধ অথচ আগ্রাসী স্বপ্ন দেখতে তৎপর থাকেন, শ্রমবিমুখ অলস, অবকাশের জন্য আনন্দ-শিল্প সৃষ্টি করেন এবং বিমূর্ত রহস্যময় বা দুর্বোধ্য ভাবময় জগতে নিজেকে এবং পাঠককে নির্বাসিত জীবনযাপনে প্রলুব্ধ করতে সক্ষম থাকেন। স্বার্থের চিরস্থায়িত্ব রক্ষার্থে খণ্ডিত এই বিশেষ দৃষ্টিতে নিরূপিত, এবং নির্বিশেষ, চিরন্তন, মহান, অসীম, অনির্বচনীয় রহস্যময়, দৈব ইত্যাদি বিশেষণে অলঙ্কৃত জীবনের অলীক মূল্যবোধগুলোই এই সব শিল্পের ফাঁপা প্রাণসত্তা।

সামাজিক জীবনের প্রয়োজনবোধেই কেবল কবিতা প্রাণিত হয়ে উঠতে পারে। নতুবা সে কি কেবলি 'অকাজের কাজ যতো, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়, রাশি রাশি আনন্দের আয়োজন?' এ আনন্দের মৌলিক ভিত্তি কোথায়? কবিতার আত্মা বলে কথিত সত্য, কল্যাণ, সুন্দরতা ও আনন্দের মাহাত্ম্য ও চিরন্তনত্ব কি তবে সময়, ভূগোল ও চরিত্রনিরপেক্ষ কোনো নিরঙ্কুশ ধারণা? স্থান-কাল-পাত্রের বিশিষ্ট অবস্থান ও অবস্থা বিচারে এসব ধারণাগুলোতে আরোপিত নিরপেক্ষতা ও চিরন্তনত্বগুণ অবশ্যই প্রশ্নাতীত নয়, এবং ধারণাগুলো সামাজিক জীবনের প্রয়োজনবোধ থেকে মুক্ত আপনাতে আপনি বিকশিতও কিছু নয়। বরং এগুলো মানুষের মূল অস্তিত্বচেতনা থেকেই উন্মোচিত। অস্তিত্বরক্ষা ও তার বিকাশের জন্যই, অর্থাৎ মৌলিক প্রয়োজন-প্রাণিত ইচ্ছাতেই মানুষ সমাজগঠনের পথে এগিয়েছে। জাগতিক অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, তাকে দীর্ঘস্থায়ী, সম্প্রসারিত, সমৃদ্ধি ও সুখময় করে তুলবার জন্য বস্তুজগৎ ও মনোজগতের যা'কিছু তার কাছে অনুকূল ও সম্ভাবনাময় বলে প্রতিভাত হয়েছে, তা-ই তার কাছে সত্য, সুন্দর, কল্যাণকর ও আনন্দময়, এবং সম্ভাবনাময়তার স্থায়িত্ব ও ক্রমবর্ধনসম্ভব বিস্তার-কল্পনাই

তার কাছে মহৎ প্রসঙ্গ বলে বিবেচিত হয়েছে। অস্তিত্ব রক্ষা, তার পরিবর্ধন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনকল্পে সমাজ গঠন, এবং সামাজিক সম্পর্ক ও জীবনের মূল্যবোধ নির্ণয়ের প্রয়োজনবোধটি মানুষের সহজাত মৌলিক প্রবৃত্তি ও অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত, এবং এই সামাজিক সম্পর্কসমূহ ও মূল্যবোধের স্থিরতা প্রাকৃতিক সম্পদ, উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগব্যবস্থার যথার্থ সঙ্গতিবিধানের ওপরই নির্ভরশীল। এই সূত্র ধরেই মানুষের মৌলিক প্রবৃত্তিসমূহ ও দৃষ্টিভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত ও উৎকর্ষিত করে সমাজের জন্য কল্যাণমুখী, সুন্দর ও মহৎ গুণাবলীতে রূপান্তরণের চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন প্রেম ও বীরত্ব সঙ্গলিপ্সা ও হিংস্রতারই রূপান্তরিত উপলব্ধি। অর্থাৎ সত্য, সুন্দর, প্রেম, কল্যাণ ইত্যাদি ধারণাগুলি নিরঙ্কুশ নিরপেক্ষ তো নয়ই বরং সামাজিক জীবনের অস্তিত্বচেতনার সঙ্গে সরাসরি সংযুক্ত, এবং সমাজের প্রয়োজনপ্রেক্ষিতেই এগুলো তাৎপর্যময় মাত্র। কবিতাও সামাজিক প্রয়োজন-প্রাণিত এই অনুভব-চিন্তা-আকাঙক্ষার সঙ্গে যুক্ত থেকেই তবে সত্য, সুন্দর, মহৎ ও তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে।

কিন্তু মানুষের বোধ, চিন্তা, জ্ঞান ও আকাঙক্ষাসমূহ নিতান্ত সরলরৈখিক নয়, বরং অস্থির ও দ্বন্দ্ববহুল। কারণ, তার পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ প্রাকৃতিক নিয়মে নিজেই পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হচ্ছে, মানুষও তাকে রূপান্তরিত করছে, বিশেষ করে, সমাজে উদ্ভূত সুবিধাবাদী ও সুবিধাভোগী প্রবল শ্রেণী বস্তুজগৎ ও মনোজগৎকে তার একান্ত স্বার্থের অনুকূলে আনতে, এবং বৃহত্তর জনসমাজকে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, তাকে প্রতিকূলতার দিকে ঠেলে দিয়ে পরাভূত করতে চেষ্টা করছে। এই উদ্দেশ্য সাধনকল্পে ইতিহাসের পথ ধরেই স্থান ও কালোপযোগী বিভিন্ন পন্থা ও অবয়বে সে তার নিজের জন্য সুবিধামতো একটা অর্থনৈতিক ভূমিতল ও তার ওপরে একটা সমাজকাঠামো গড়ে তুলতে চেষ্টা করছে। সমাজজীবনের বিবর্তনের ইতিহাস তাই নিরন্তর দ্বন্দ্বমুখর। এই দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় প্রয়োজন, দায়িত্ব, সত্য, কল্যাণ, সৌন্দর্য, বা শিল্পকাব্য-ধারণা নিরঙ্কুশ নিরপেক্ষ থাকতে পারে না। অর্থনৈতিক ভিত্তি যা-কিনা সমস্ত ঐতিহাসিক বিবর্তনকে পরিচালিত করে, শিল্প-সাহিত্য-দর্শন, সংস্কৃতি বা অন্যান্য উপরকাঠামো তারই ওপর গড়ে ওঠে। এই দৃষ্টিতে শিল্প-সাহিত্য-দর্শন, বা সংস্কৃতি; গৌণ বিষয়। কিন্তু মুখ্যের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রেই তা গৌণ, স্বাধীন নিরপেক্ষ গৌণসত্তা বলে তার কিছু থাকতে পারে না। শিল্পের বিবর্তন ও শিল্পের ইতিহাস সামাজিক বিবর্তন ও তার ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। খণ্ডিত সমাজে সামাজিক মানুষ হিসেবে একজন কবি বা শিল্পী কখনো নিরপেক্ষ স্বাধীন নন; তিনি পরিপার্শ্বের বস্তুজগৎ, মনোজগৎ ও সামগ্রিকভাবে সামাজিক বিবর্তনের নিয়ামক শক্তিসমূহের শর্তাধীন। কিন্তু শিল্পসৃষ্টিতে তিনি যখন দায়হীন স্বাধীন ব্যক্তির মতো আচরণ করেন, তখন হয় তিনি সাধারণভাবেই বিভ্রান্তির শিকার, নতুবা সচেতনভাবেই অসামাজিক, স্বেচ্ছাচারী। শিল্পের স্বাধীনতা অবশ্যই সৃজনশীলতায়, কিন্তু জীবনঘনিষ্ঠ পারিপার্শ্বিক পরিমণ্ডল ও বস্তুসত্যের সচেতন উপলব্ধিই সেই সৃজনশীলতার উৎস, বস্তু ও বিষয়সত্য নিরপেক্ষ কোনো কল্পভাব-সত্য নয়।

[দুই]

কবিতা সমাজজীবনের উপর কাঠামোর প্রস্ফুটন হলেও তা আপনাতে আপনি বিকশিত কোনো বৃন্তহীন কুসুম নয়। অর্থাৎ কবিতা গৌণ বিষয় হলেও মুখ্য সমাজজীবন চেতনার নিরিখেই তার গৌণতার মর্যাদা মূল্যায়িত। দ্বন্দ্বমুখর সামাজিক জীবনের প্রগতির প্রশ্নে, গৌণ হলেও তার নিজস্ব একটা সক্রিয় ভূমিকা আছে। কারণ, কবিতাকর্মও একটা শ্রমঘটিত সচেতন ক্রিয়া, এবং সকল প্রকার শ্রমকেই ব্যক্তির নিজেরই প্রয়োজনে

মানুষের সামাজিক অস্তিত্বের সৃষ্টিশীল বিবর্তনের পরিকল্পনাসূচীতে সক্রিয় থাকার কথা। সামাজিক মানুষ হিসেবে কবির এই কবিশ্রম তাঁর সুসঙ্গত অস্তিত্বের অনুসন্ধান ও আবিষ্কারে, অস্তিত্বের অনুভবে ও ঘোষণায়, এবং এই অস্তিত্বের সম্ভাবনাময় প্রগতিশীল বিকাশে তাৎপর্যময় প্রেরণাদানে নিয়োজিত। সমাজবিবর্তনের ধারায় কবিতার সক্রিয় গৌণ ভূমিকাকে উপমায় এভাবে ব্যক্ত করা যেতে পারে যে, মূল জলপ্রবাহের আলোড়ন-আবেগে উপরভাগে উত্থিত তরঙ্গ নিজে প্রবাহের নিয়ামক শক্তি নয় বটে, কিন্তু যে প্রবাহের আলোড়নে তার সৃষ্টি, সে তারই শরীরে তাড়না-প্রচাপ সৃষ্টি করে তার গতিকেই আবার আনুকূল্য দান করে, এবং একই সঙ্গে নদীর সামগ্রিক অভিযাত্রাকে সরব, সাঙ্গীতিক, বর্ণাঢ্য ও সমারোহপূর্ণ করে তোলে। উপমাটি সর্বময় না হতে পারে, যেহেতু উপমা উপমাই, তবু সমাজ-বিবর্তনের ধারায় কবিতার, সে যতো গৌণই হোক, নিজস্ব সক্রিয় ভূমিকাটিতে এভাবে ইঙ্গিত করা যেতে পারে। আসলে অচেতন ও স্বভাবজ জলতরঙ্গের ভূমিকার চেয়ে কবিতার ভূমিকা অধিক দায়িত্বপূর্ণ; কারণ, কবিতা কবির সচেতন মনের সৃষ্টি। উদ্‌ঘাটিত বস্তুসত্য বা ভাবসত্য কবির কাছে তখনি সত্য, তখনি সুন্দর এবং তখনি কল্যাণকর ও মহান বলে প্রতিভাত হয়, যখন তা সামাজিক মানুষ হিসেবে কবির অস্তিত্বের স্থায়িত্ব, ক্রমবিবর্তন ও ক্রম-সমৃদ্ধির অনুকূল উপাদান, উৎস বা প্রেরণা বলে বিবেচিত হয়। কবির এই অস্তিত্বচেতনা ব্যক্তিক, এবং একই সঙ্গে সামাজিক। বস্তুজগৎ ও মনোজগতের মধ্যে আকাঙ্ক্ষাময় সূক্ষ্ম দৃষ্টি সঞ্চালিত করে কবি এই উৎস ও প্রেরণাকে অনুসন্ধান করেন, আবিষ্কারকে অনুভব ও মূল্যায়িত করেন, এবং চৈতন্যের পরিকল্পিত প্রয়োগে সৃষ্টি করেন। বস্তুজগৎ ও মনোজগতের ভেতরে-বাইরে তাঁর এই দৃষ্টিপাত, আবিষ্কার-উদ্‌ঘাটন ও সৃজনকর্ম তাই সচেতন ও উদ্দেশ্য প্রাণিত। পক্ষান্তরে, কবিতা কবির অভিজ্ঞতালব্ধ ও পরিকল্পিত ভাবসত্যের শিল্পসম্মত সচেতন প্রকাশ; আর সচেতন বলেই তা লক্ষ্যমুখী। সুতরাং সমাজবিবর্তন প্রবাহের মূল অভীষ্টের সঙ্গে নিজের লক্ষ্যকে কবিতা সচেতনভাবে সংযুক্ত ক'রে তার প্রকৃত গৌণ ভূমিকাকে বিশিষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। তরঙ্গ বিভিন্ন দেহভঙ্গিমায় বিচিত্র আলো ছায়ায় মনোমুগ্ধকর, ও কলধ্বনি বা গর্জনমুখর হয়ে উঠেও সে মূল প্রবাহেরই চরিত্রানুকূল থাকে। প্রবাহ থেকে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হয়ে সে বাষ্পীভূত হতে পারে, কুয়াশা-কুহেলিকা হয়ে বুকে ইন্দ্রধনুবিভ্রান্তি আঁকতে পারে, কিন্তু প্রবাহচ্যুত-সে তার তরঙ্গচরিত্রটি হারায়।

সুতরাং কবিতা সামাজিক জীবনের নিগূঢ়তম প্রয়োজনবোধের গভীরে শিকড়বিদ্ধ থেকেই জীবনের নিগূঢ়তম অভীপ্সার দিগ্‌বলয় পর্যন্ত প্রসারিত হয়। সামাজিক জীবনের প্রয়োজনচেতনাসমূহ যতো একই উৎসকেন্দ্রিক ও ইতিহাস-ঐতিহ্য গভীর, এবং সামাজিক জীবনের দিগন্ত যতো বেশি উন্মোচিত হয়, কবিতার শিকড় ততো সুপ্রোথিত হবার সুযোগ পায়, প্রশস্ততর অভিযান-অভিসার ক্ষেত্রে সে ততো বেশি মুক্তি লাভ করে। সমষ্টির মুক্তি ছাড়া ব্যক্তির মুক্তি নেই, ব্যক্তি হিসেবে কবিরও নেই, কবিতারও নেই। কিন্তু সব মুক্তিই আবার অস্তিত্বের প্রয়োজনের কেন্দ্রে বাঁধা। বিভক্ত সমাজে সামাজিক প্রয়োজনবোধ ও বিবর্তনের উৎসারণকেন্দ্র খণ্ডিত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন সমতলে গিয়ে অবস্থান গ্রহণ করে, এবং সুবিধাবাদী ও সুবিধাভোগী প্রবল শ্রেণী, প্রতিভা ও শ্রমসহ সমাজের সমস্ত শক্তি ও উপাদানকে নিজ নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রিক পরিধি-বলয়ের মধ্যে আকর্ষণ করে। শ্রেণী নতুন নতুন বিচ্ছিন্নতার জন্ম দেয়, এবং ব্যক্তিকে একই উৎসকেন্দ্রিক সামাজিক প্রয়োজনবোধ থেকে কেবল বিচ্ছিন্ন করে না, ব্যক্তিকে তার নিজের অস্তিত্ব থেকেও বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। সমাজজীবনের মর্মগত এই এক-কেন্দ্রিক প্রয়োজনবোধ ও অভীপ্সার বলয় থেকে কবিতা যতোখানি বিচ্ছিন্ন, সে ততোখানি উৎকেন্দ্রিক, অসামাজিক, বা দিগ্‌ভ্রান্ত।

[তিন]

কবিতা কবির ব্যক্তিচিত্তে বিধৃত জীবনচেতনার সামাজিক স্বীকৃতি-নির্ভর ভাষাশিল্প-সঙ্গত সচেতন অভিব্যক্তি। তাঁর জীবনচেতনা অবশ্যই সমকালে দ্বন্দ্বমুখর ও বিবর্তন-চঞ্চল জীবনপ্রবাহ থেকে অর্জিত, এবং কবিতায় তা, সমকালের পাঠক সমাজের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। তাঁর সহানুভূতিশীল পাঠকসমাজের সম্প্রসারণই তাঁর কবিতার স্বীকৃতির সম্প্রসারণ। সমকালের সামাজিক জীবন-সত্যের অন্বেষণ ও উপলব্ধি এবং সমকালের পাঠকচিত্তে কবিতার আবেদন সৃষ্টির সাফল্যের মধ্যেই কবিপ্রতিভার স্ফূর্তিলাভ ঘটে। অর্থাৎ কবি-প্রতিভার সৃজনশীলতা কবির সমসাময়িককালের সামাজিক মানুষের জীবনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির শর্তাধীন। অতীত মৃত; মৃতলোকে বাস করার আগ্রহ মানুষের নেই, মৃতকে নিয়ে জীবনযাপনও করতে চায় না সে। অতীতের ততোটুকু মাত্র তার কাছে গ্রাহ্য, যতোটুকু তার বর্তমানিক প্রয়োজনচেতনার আলোকে মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। আর ভবিষ্যৎ তো কাল্পনিক এক অনিশ্চিত সম্ভাবনা কেবল, অথবা সম্ভাবনার পরিকল্পনামাত্র; এবং তা' বর্তমান অস্তিত্বেরই সম্প্রসারণের পরিকল্পনা। বর্তমানই মানুষের কাছে জীবন্ত, চিত্তাকর্ষক ও আগ্রহোদ্দীপক। কারণ, বর্তমানের প্রতিটি মুহূর্তই তার অস্তিত্ব। আর এই অস্তিত্ব নিয়েই তার যতো চিন্তা-ভাবনা, সুখ-দুঃখ। তাই সমকালের জীবন-জিজ্ঞাসা কবি ও পাঠক উভয়কে গভীরতম সহানুভূতিতে পরস্পর পরস্পরের মুখোমুখী করে রাখে। কিন্তু কবি যখন নিছক অতীতচারী, কালের পাঠক তখন তার কাছে অনাত্মীয় বলে বিবেচিত। তিনি যখন কেবল অনাগত কালবিহারী স্বাপ্নিক ও ভবিষ্যতের পাঠক-সমাজ-নির্ভর, তখনো তা একই বিবেচনাপ্রসূত। অর্থাৎ অস্তিত্বময় সময় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তিনি তখন অস্তিত্বহীন সময়শূন্যতায় সমর্পিত, তখন তিনি মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিমূর্ত মানবতার উপাসক, দ্বন্দ্বক্ষত বর্তমানের প্রয়োজন ও কৌতূহলবোধ থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নিয়ে তিনি তখন দায়হীন কল্পকালের নিঃসীমলোকে পলাতক। কালের সামাজিক স্বীকৃতিতে তার আস্থা নেই, অমরত্বের আকাঙ্ক্ষায় তিনি অন্তহীন চিরভবিষ্যতে আস্থাবান। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সামাজিক স্বীকৃতি তার কাছে অবান্তর হলেও শ্রেণীস্বীকৃতি তিনি লাভ করতে পারেন। কারণ, শ্রেণী এই বিচ্ছিন্নতাবাদেরই ভক্ত। শ্রেণীশিল্প সৃজনে অবাধ স্বাধীনতাদানের এবং প্রতিষ্ঠানিক প্রচারবলে অমরত্ব দানের আশ্বাসে কাল থেকে, স্থান থেকে ও মানুষ থেকে শিল্পীকে বিচ্ছিন্ন করে, প্রকারান্তরে তার নিজেরই নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রিক পরিধি-বলয়ের মধ্যে তাঁকে আকর্ষণ করতে উৎসাহী। সুবিধাভোগী শ্রেণীর, বা তেমন শ্রেণীতে লালিত বা লালন-প্রত্যাশী শিল্পী বা কবি এভাবে তাঁর কালের সামাজিক দ্বন্দ্বক্ষুব্ধ জীবনাকাঙ্ক্ষা তৃপ্তির শর্তসমূহকে শিল্পীস্বাধীনতার বিরুদ্ধশর্ত বলে ভাবতে অভ্যস্ত হন। বরং বিমুক্ত শিল্প, বিমূর্ত শিল্প, বিশুদ্ধ কবিতা, শাশ্বত কাব্যরস, চিরন্তন সৌন্দর্য ইত্যাদি ফাঁপা অত্যুচ্চ ধারণাগুলো সামাজিক সম্পর্কমুক্ত শিল্পীর ব্যক্তি-প্রতিভাকে শর্তহীন স্বাধীন কল্পনাসর্বস্ব, জটিল ও দুর্বোধ্য শিল্প-কাব্য সৃজনের, এমনকি সৃজনে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার আনুকূল্য দান করে বলে তিনি এগুলোতে আস্থাবান থাকেন। প্রকৃতপক্ষে এসব ধারণা উৎকেন্দ্রিক স্বয়ংস্বয়ম্ভু ভাববাদের প্রশ্রয়ে সময়, ভূগোল ও জীবন্ত সামাজিক মানুষ থেকে শিল্প বা কবিতাকে বিচ্ছিন্ন, অর্থাৎ শর্তমুক্ত করে তাকে চিরকালের নির্বিশেষ নির্বস্তুক ভাবসত্তার রূপ পরিগ্রহ করতে, এবং এভাবে সমকালের জীবনপিপাসু পাঠক সমাজের জীবনতৃষ্ণাকে স্বকালের দ্বন্দ্বমুখর জীবনঘনিষ্ঠ মানবিক রস থেকে, ব্যাখ্যাহীন চিররহস্যময় কল্পরসমুখী করে তুলতে প্ররোচিত করে। ফলতঃ বস্তুসত্যহীন বক্তব্যহীন অসার কল্পনাসর্বস্ব ভাবসত্য ও সেই প্রাণহীন ভাবসত্যের যান্ত্রিক জটিলতাচর্চা, এবং বিকল্পে ক্ষতিপূরণস্বরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষামূলক বিচিত্র অদ্ভুত বা উদ্ভট রূপাঙ্গ ও শব্দচর্চা ক্রমবর্ধমান হারে পাঠকসমাজকে কবিতায় অনাসক্ত

বা একেবারেই কবিতাবিমুখ করে তোলে। পাঠকের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, সমকালের সংঘর্ষ ও বিরোধ-বহুল সামাজিক জীবনপ্রবাহে কবিতার কোনো সক্রিয় ভূমিকাই নেই, কবির কাছে সমাজের কোনো প্রত্যক্ষ দাবী নেই, বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে, সরাসরি যোগসাধনের কোনো দায়িত্ব কবির নেই, এবং কবিতাপাঠ কেবল বিশেষ প্রশিক্ষণসাপেক্ষ উচ্চাঙ্গের আলস্য-বিলাসচর্চা, 'অকাজের কাজ যতো, আলস্যের সহস্র সঞ্চয়,' এবং কারণবিহীন 'রাশি রাশি আনন্দের আয়োজন'।

[চার]

সামাজিক মানুষের সবরকম শ্রমই সার্বজনীন সামাজিক উত্তরণ ও বিকাশে নিয়োজিত থাকে বলে, এবং সমষ্টির উত্তরণ ও বিকাশ ছাড়া ব্যক্তির উত্তরণ ও বিকাশ নেই বলে, সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে কবির কবিশ্রম ও প্রতিভা পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ-মণ্ডলিত এবং সমকালের, অর্থাৎ এক ঐতিহাসিক কালের সামাজিক অবস্থা ও সম্পর্ক বিধৃত তাঁর সঙ্গত অস্তিত্ব বা সত্তার অনুসন্ধান-আবিষ্কারে, অস্তিত্ব অনুভবে ও ঘোষণায় এবং এই অস্তিত্বের সম্ভাবনাময় প্রগতিশীল বিকাশে, তাৎপর্যময় প্রেরণাদানে নিয়োজিত। সুতরাং প্রতিভা-শ্রম ব্যবহারে কবি একই সঙ্গে বিষয় বা বক্তব্যসচেতন, প্রকাশ বা ভাষাসচেতন, এবং উদ্দেশ্য বা প্রচারলক্ষ্য সচেতন। উদ্‌ভাসিত, উদ্‌ঘাটিত বা আবিষ্কৃত কোনো জীবনোপলব্ধিই তাঁর বিষয় বা বক্তব্য, ভাষামূর্তিতে সেই উপলব্ধির আত্মপ্রকাশ, এবং সামাজিক জীবনবোধের প্রগতিশীল বিবর্তনে-বিকাশে সক্রিয় ভাবপ্রেরণাদানই তাঁর লক্ষ্য। কবির ব্যক্তিচিত্তে অনুভূত জীবনোপলব্ধি সামাজিক সহানুভূতি ও অনুমোদনলাভের জন্যই ভাষামূর্তি গ্রহণ করে, এবং সমাজচিত্তের ক্রমোত্তরণ ও বিকাশের অনুকূল বলে বিবেচিত হলে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর বলে তা' সমাজস্বীকৃতি লাভ করে। কবিতা রচনা ও কবিতাপাঠের আনন্দ তাই বহুর সঙ্গে একের, এবং একের সঙ্গে বহুর মিলনের আনন্দ। কবিতার চূড়ান্ত সার্থকতা ব্যক্তিকতা বা নৈর্ব্যক্তিকতায় নয়, বরং বহুব্যক্তিকতায়; অস্তিত্বের প্রতি উদাসীনতা বা বিচ্ছিন্নতা বোধ প্রকাশে নয়, বরং তার প্রতি উষ্ণনিবিড় আগ্রহ প্রকাশে। কবিতায় মানব-সমাজের জন্য তাই জগৎ ও জীবনঘনিষ্ঠ কোনো প্রেরণাময় বক্তব্য বা ব্যঞ্জনাময় বাণী থাকে। 'শুধু অকারণ পুলক', 'কেবলি আনন্দগত আনন্দ,' অথবা 'অকারণ আঁখিজল' বলে মূলতঃ কিছুই নেই। অস্তিত্ব বা সত্তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে কৌতূহলী কবির যে আনন্দ, তা' সত্তাকে আবিষ্কারের বা উন্মোচনের আনন্দ, তাকে অনুভব-উপভোগের আনন্দ, তাকে ভাষামূর্তি বা ভাষামুক্তি দানের আনন্দ এবং ভাষার মধ্য দিয়ে মানুষকে প্রেরণাদানের সাফল্যলাভ অর্থাৎ সমাজ-স্বীকৃতিলাভের এবং এভাবে সমষ্টির সত্তার সঙ্গে কবির ব্যক্তিসত্তার মিলনের আনন্দ। উন্মোচিত জীবন-রহস্য ও বস্তুরহস্য যদি অস্তিত্বসঙ্গত ও সত্তানুকূল হয়, তবে বিষয় হিসেবে তা' আনন্দানু-ভূতির, এবং যদি অসঙ্গত ও প্রতিকূল হয়, তবে তা' দুঃখানুভূতির বলে কবিচিত্ত সনাক্ত করে। [খণ্ডিত সমাজে অস্তিত্বের অনুকূলতা-প্রতিকূলতার ধারণা এবং তার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ সুখানুভূতি-দুঃখানুভূতি এবং অন্যান্য রসানুভূতি কবির শ্রেণীচরিত্র দ্বারা প্রভাবিত বা শ্রেণী নিয়ন্ত্রণে স্বভাবভ্রষ্ট হয়।] এই অনুকূল প্রতিকূল অনুভবকে কবিতায় উপভোগ্য করে তুলতে গিয়ে উচ্চাঙ্গের শিল্পলালনদক্ষতা ও শব্দকলানৈপুণ্যে কবি তাতে যতো স্থূল-সূক্ষ্ম, চারুকারুকার্যময় বিলাসী বৈচিত্র্য ও ধ্বনিময় রূপময় উপমা--অনুপ্রাস-চিত্রকল্পের চমৎকারিত্ব আনুন না কেন, তাঁর সমস্ত প্রকাশ-কলাকৌশল অবলম্বনের নিগূঢ় লক্ষ্য অবশ্যই তাঁর মূল অনুভব, বা বক্তব্য বিষয়কে সমাজচিত্তের গভীরে সঞ্চার করে দেয়া; এবং অবশ্যই তাকে আত্মভোগসর্বস্ব করে তোলা নয়। কবিতাশ্রয়ী এই বক্তব্য বিষয় মানব-অস্তিত্বকেন্দ্রিক বলে, এবং সামাজিক মানুষের জন্য তা' প্রত্যয়ী প্রেরণা বলে কবিতার

বক্তব্যকে বাণী নামে বিশেষিত করা হয়, শব্দ, ধ্বনি, ছন্দ, উপমা, চিত্রকল্প, বাকরীতির কুশলী প্রয়োগ এই বাণীকেই ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। কবিতার ভিতরসম্পদ তাই অস্তিত্বের কোনো না কোনো প্রেরণাময় বাণী, অনির্বচনীয় বাণী নয়, রূপময়, সুরময়, ছন্দোময়, ব্যঞ্জনাময় বাণী।

[পাঁচ]

কবিতায় শব্দের ভূমিকা উল্লিখিত কারণে তাই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, কবিতার ভিতর-সম্পদ এক ঐতিহাসিক কালের বস্তুজগৎমণ্ডলিত এবং সামাজিক কাঠামোয় মানবীয় সম্পর্কবিধৃত বিবর্তনচঞ্চল অস্তিত্বের অনুভব বটে, তবে তা অবশ্যই ভাষাশিল্পরসাশ্রয়ী। কিন্তু কবিতার বিষয়সম্পদ এবং কবিতার ভাষা ও শব্দশিল্পের পারস্পারিক গুরুত্ব উল্লেখ প্রসঙ্গে উচ্চারিত ইঙ্গিতময় প্রসিদ্ধ উক্তিসমূহ সাধারণতঃ ভিতরে-অনেকাংশে সৎ থেকেও বাক্‌চাতুর্যে কখনো কখনো এমনি খণ্ডাংশপ্রধান হয়ে ওঠে যে, আমরা তাদের অখণ্ড তাৎপর্য গ্রহণে চমৎকারভাবে নিরুৎসাহিত অথবা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ার সুযোগ গ্রহণ করি। 'কবিতা কথিত বিষয় নয়, বিষয়ের কথন', 'কবিতা শব্দ দিয়ে লেখা হয়, ভাব দিয়ে নয়', 'কবিতা হচ্ছে শব্দ সমাবেশ', 'কবিতার কথা হচ্ছে শব্দ ব্রহ্ম', 'শব্দই কবিতা', ইত্যাদি উক্তিগুলো দিয়ে শব্দকে ত্বকগভীর অর্থে মাত্র ব্যবহার করার দ্বার উন্মুক্ত করে নিই। 'কবিতা কথিত বিষয় নয়, বিষয়ের কথন', হাউসম্যানের এই উক্তিটি অনুসরণ করতে গিয়ে বিষয়-উদাসীন এক কথনশিল্পকর্মকেই যদি কবিতা-কর্ম ভেবে তৃপ্ত থাকে, তবে কবিতা একটি শব্দক্রীড়াচাতুর্যসর্বস্ব বাকপ্রদর্শনী ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃতপক্ষে কথ্য বিষয়ের প্রাণময়তা ও ঐশ্বর্যের জোরেই কথনক্রিয়া কেবল অভিনব শিল্পকলাসুন্দর হয়ে উঠবার দাবী করতে পারে। 'কবিতা শব্দ দিয়ে লেখা হয়, ভাব দিয়ে নয়', মালার্মের এই উক্তির প্রথম খণ্ডই কি 'কবিতা হচ্ছে শব্দ সমাবেশ', কডওয়েলের এই সংক্ষিপ্ততর উক্তির সীমানায় সঙ্কুচিত হতে হতে শেষ পর্যন্ত 'শব্দই কবিতা', এমন সংক্ষিপ্ততম কলেবর গ্রহণ করে নিজের অখণ্ড সম্পূর্ণতা লাভের কথা ঘোষণা করে? ভাব দিয়ে অবশ্যই কবিতা লেখা হয় না, কেননা, ভাব মানসলোকচারী অঙ্কন অসম্ভব এক অবয়বহীন অনুভব মাত্র। এবং শব্দ দিয়ে লেখা হয়, কেননা, শব্দ সেই অবয়বহীন ভাবের উচ্চারণসম্ভব এবং অঙ্কনসম্ভব ধ্বনিময় আক্ষরিক কায়া। কিন্তু এমন নিরীহ সাধুব্যাখ্যা দিয়ে কবিতার স্বভাবকে নির্দেশ করা যায়না এ জন্য যে, ভাব ভাষার এমন শব্দগত সম্পর্ক গদ্যেও উপস্থিত। গদ্য ও কবিতায় শব্দ ব্যবহারের পার্থক্য সম্পর্কে সাধারণ বক্তব্য এই যে, গদ্যে ব্যবহৃত শব্দ সামাজিক মানুষের অভিজ্ঞতা ও স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে আগত ভাবধারণার, বা বস্তুর সুনির্দিষ্ট নাম বা চিহ্ন, এবং এ শব্দনাম অন্য কোনো ভাবধারণা বা বস্তুর প্রতীক চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার্য নয়; অথচ, কবিতায় ব্যবহৃত শব্দ নির্দিষ্ট ভাব বা বস্তুর প্রাক-নির্দিষ্ট নামচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে, অতিরিক্ত, এমন কি অন্য কোনো ভাব বা বস্তুসত্তার ইঙ্গিতময় প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু শব্দের এরকম ব্যবহার যথার্থ বিচারে প্রমাণ করে না, বা দাবীও করে না যে, শব্দনাম নির্দিষ্ট ভাব-অর্থ বা বস্তুসত্তাকে বর্জন করে একেবারে স্বাধীন বস্তু-ভাবনিরপেক্ষ হয়ে পড়ে, অথবা উভয়কে বর্জন করে কেবল অদ্ভুত ধ্বনি সমষ্টির প্রতীক-চিহ্ন হয়ে থাকাটাই তার কাজ। বরং এক অর্থকে বর্জন করে, অতিরিক্ত-অথবা সঙ্গত অপর কোনো অর্থ-ভাবব্যঞ্জনার সে দ্যোতক হয়ে ওঠে। কবিতায় সুনির্দিষ্ট অর্থবহ পরিচিত সামাজিক শব্দের ব্যক্তিগত ব্যবহার এভাবেই ঘটে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত ব্যবহার নিশ্চয়ই এমন স্বেচ্ছাখেয়ালী হয়ে উঠতে পারেনা, যাতে কেবল কবির শর্তহীন অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণকে বুঝায়, কিন্তু তাঁর সৃজনের দায়িত্ব গ্রহণকে বুঝায় না। কারণ, কবিতায় শব্দের এই ব্যক্তিগত ব্যতিক্রমী ব্যবহারের সুযোগ নিয়েই সামাজিক শব্দবিধৃত

সমাজমানস-সংলগ্নতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আত্মপ্রতারণার বহুমুখীপথ আবিষ্কার করা সম্ভব। আসলে, কবিতায় শব্দের অর্থান্তর ঘটলেও, শব্দ তার পূর্ব অর্থ ও ধ্বনির স্মৃতিকে কখনো নিঃশেষে হারায় না। সে, অর্থাৎ কবিতায় অতিরিক্ত, অতিক্রান্ত এবং ভিন্ন অর্থ-ব্যঞ্জনায় ব্যবহৃত সামাজিক বা আভিধানিক শব্দ, তার ধ্বনিবৈশিষ্ট্যসহ ভাব-অর্থ অথবা তার ধ্বনিবৈশিষ্ট্যসহ ভাব-অর্থের পূর্বস্মৃতি, এবং উদ্ভাবিত ধ্বনিব্যঞ্জনাময় ভিন্ন ভাব-অর্থের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা লক্ষ্যভাবে রচিত উপমা-কল্পনা, সাদৃশ্য, প্রসঙ্গ, অনুষঙ্গ ও দূরান্বয়ের সেতু অতিক্রম বা পারাপার করে মাত্র। আকস্মিক উচ্চ লম্ফনক্রিয়া এ স্থলে খুব একটা নাটকীয় ব্যাপার হতে পারে বটে, কিন্তু সেতু-মঞ্চের বাইরে শব্দের সশব্দ পতনও তবে অনিবার্য। প্রকৃতপক্ষে, শব্দনামের প্রাকনির্দিষ্ট এবং ভিন্নতর, এই উভয় ভাব-অর্থ-ধ্বনি বৈশিষ্ট্যকে বর্জন একেবারেই কল্পনা-অসাধ্য ব্যাপার। কল্পনাসাধ্য বলে দাবী করলে, কবিতার শব্দচরিত্র প্রসঙ্গে তবে নির্দ্বিধায় বলতে হয় যে, কবিতার শব্দ কণ্ঠযন্ত্র উৎপাদিত একপ্রকার অঙ্কনসম্ভব অদ্ভুত ধ্বনির চিহ্ন মাত্র এবং 'কবিতা ভাব দিয়ে লেখা হয় না, কলম দিয়ে লেখা হয়'।

সুতরাং শব্দই কবিতা, কবিতা হচ্ছে শব্দ সমাবেশ, কবিতার শব্দই ঈশ্বর, ইত্যাদি উক্তিগুলির সঙ্গে বহু গভীরতর প্রসঙ্গ জড়িয়ে আছে, এবং তাদের সমবেত নেপথ্য গুঞ্জনেই কেবল সংক্ষিপ্ততম ও আপাতঃনিঃসঙ্গ উক্তিগুলি বাকমুখর হয়ে উঠতে পারে। তবুও কবিতার স্বভাব সম্পর্কে শর্তসাপেক্ষে উচ্চারিত খণ্ডাংশপ্রধান উক্তিগুলি এপ্রশ্ন এড়িয়ে যেতে পারেনা যে, শব্দ ও ভাষা যদি ভাব ও কল্পনার মর্মস্থল থেকে স্বতঃ-স্ফূর্তভাবে উচ্চারণ-জন্ম গ্রহণ করে, অথবা শব্দ ও ভাষা ছাড়া ভাবের যদি আলাদা অস্তিত্ব না থাকে, তবে অনুভূতির তীব্রতম মুহূর্তেও সচেতন শ্রম প্রয়োগে উপযুক্ত শব্দ সন্ধান ও ভাষা আবিষ্কারের, বা শব্দকে ভাঙা-গড়ার প্রয়োজন হয় কেন? কিংবা কবিতার ভাষা বা শব্দ পাঠকচিত্তে যে রসের সৃষ্টি করে, তা ভাবরস, না নিছক ভাষারস—শব্দরস? অথবা, একদিকে ভাব, এবং অন্যদিকে শব্দ বা ভাষাকে দুটি বিষয় হিসেবে গণ্য করে আদৌ তুলনামূলক ইঙ্গিত দান কেন? একি তবে 'ভূত নেই, তবে ভূতের ভয়' থেকে সাবধান থাকা? এ ভাবে 'কবিতা শব্দ দিয়ে লেখা হয়, ভাব দিয়ে নয়' এবং 'কবিতায় ভাবটাই আসল, অন্য সব ভ্রান্তি', মালার্মে ও ম্যাথু আর্নল্ডের দুটি উক্তিকে পাশাপাশি স্থাপন করে দুটি বিরোধী বিশ্বাসের প্রেরণা নিয়ে কবিতার সত্তাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখবার উৎসাহ সংগ্রহ করতে পারি।

সমাজ-জীবন উদাসীন শব্দসর্বস্ববাদী কবিরা অবশ্য কবিতায় একটা তৃতীয় পরোক্ষ ভুবন নির্মাণের অভিলাষী। তাঁদের উপজীব্য শব্দনামে চিহ্নিত বস্তু ও ভাব নয়; শব্দই তাঁদের উপজীব্য, অথবা শব্দের ভেতর দিয়ে দেখা, অথবা শব্দে প্রতিফলিত জগৎ ও জীবন। শব্দই বিষয়বস্তু শব্দই উপায়, এবং শব্দই পরিণাম। তাঁরা শব্দের ওজন, আকার, স্বচ্ছতা, কোমলত্ব-কাঠিন্য ও ধ্বনিগুণ, এমন কি তার গন্ধ ও রং পর্যন্ত নাকি পরীক্ষা করেন; তারপর নির্বাচিত শব্দ বা শব্দাবলীর ভেতর দিয়ে জীবন ও জগৎকে অব-লোকন করেন, এবং সুকৌশলে সেই শব্দাবলীর জাল পেতেই আবার অবলোকিত শিকারকে ধরা-বন্দীর খেলা করেন। শব্দসর্বস্ববাদী কবির দৃষ্টিতে শব্দ ভাবের পোষাক নয়, শব্দ নিজেই অস্থিরক্তমাংসময় শরীর, সম্ভবতঃ শৈশবহীন, কৈশোরহীন, সামাজিক সম্পর্কহীন উর্বশীর স্বচ্ছ বিনগ্নশরীর। কবিতাচর্চা মানে শব্দশরীরচর্চা। অথবা, শব্দ এখানে যেন এমন এক প্রণয়সন্ধানী রূপসী, যে নিজের স্বামীকে বর্জন করে অন্যের স্বামীর প্রকাশ্য অভিসারে যায়, নতুন নতুন প্রণয়ী শিকারের জন্য নিজের শরীরকে লেলিয়ে দিয়ে ফাঁদ পাতে। অসামাজিক কবিতার বিলাসী ভুবনে শব্দেরা প্রহরে প্রহরে নতুন নতুন রূপের পেখম মেলে নাচের বিচিত্র মুদ্রা দেখায়, গানের সুরে প্রলাপ বকে, অচেনা প্রণয়ীদেরকে

ঘরে আনে, কিন্তু ফসল ফলানোর ভার নেয় না, কারণ তা তাদের কাম্য নয়। সমাজ-মানস থেকে শব্দেরা এখানে মুক্ত, কিন্তু শ্রেণী বা ব্যক্তির বিলাসকক্ষসমূহে তারা রক্ষিতার মতো ক্রমহস্তান্তরের মধ্য দিয়ে বিলাসী উপভোগে ব্যবহৃত। শব্দই যদি কবিতা হয়, এবং কবিতা যদি হয় বিবর্তনকামী সামাজিক মানুষের উন্মোচিত অস্তিত্বের সংবাদ, প্রেরণাময় বাণী, এখানে তবে কবিতা বন্ধ্যা। রূপসীর ছলাকলাময় কৃত্রিম গান, অসামাজিক আলস্যেরই সহস্র সঞ্চয়, রাশি রাশি আনন্দের আয়োজন।

[ছয়]

সুতরাং কবিতার যে গভীরতর সামাজিক ভূমিকা রয়েছে, এবং যে উদ্দেশ্যে তার এই ভূমিকা পালন, যেহেতু কবিতা হচ্ছে শব্দ সমাবেশ, বা শব্দই কবিতা, শব্দাবলী সেই ভূমিকা পালনের দায়িত্ব থেকে পালিয়ে যেতে পারে না। অবশ্য শব্দের আভিধানিক ভাব-অর্থের অতিক্রান্ত অপর ভাব-ব্যঞ্জনায় সুসঙ্গত উত্তরণের সঙ্গে এই পালিয়ে যাবার সম্পর্ক নেই। কেননা, বন্ধ্যা ব্যাভিচারী শব্দের অসামাজিক অথবা স্বেচ্ছাখেয়ালী আচরণ নিন্দিত হলেও কবিচিত্তের গভীর অনুভূত, পরিকল্পিত ও আবিষ্কৃত সাদৃশ্য, উপমা-কল্পনা, দূরান্বয় ও প্রসঙ্গে সেতু পার হয়ে আভিধানিক ভাব-অর্থ অতিক্রান্ত সামাজিক অস্তিত্ব ঘনিষ্ঠ নতুন অর্থ-ভাবব্যঞ্জনায় উত্তরণের অধিকার কবিতার শব্দাবলীর আছে। নতুবা কবিতা নামক শিল্পকর্মটিকে নিষ্ঠুরভাবে একেবারেই বর্জন করে কেবল অভিধান সম্মত শব্দ ব্যবহারে ধন্য গদ্যকর্মকে নিয়েই তৃপ্ত থাকতে হয়। অধিকন্তু গদ্যে সঙ্গতভাবে ব্যবহারযোগ্য আভিধানিক শব্দেরও তো সমাজ-বিবর্তনের ফলে অর্থ সঙ্কোচন, সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন ঘটে থাকে। তবে শব্দার্থের এই বিচলন, বিবর্তন ও পরিবর্তন সমাজ-মানসের বিবর্তনের ফলেই সংঘটিত হয়। বিবর্তনে রূপান্তরিত সমাজ তার নতুন চিন্তা-অনুভব-ইচ্ছাকে প্রকাশ করার জন্য শব্দ-ভাণ্ডারের অবক্ষয়িত কিংবা পরিত্যক্ত মূল্যবোধে নিষ্প্রভ, ও বর্তমানে হৃততাৎপর্য শব্দসমূহের ভাব-অর্থের পরিবর্তন ঘটানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। এ ক্ষেত্রে শব্দার্থের এবং ভাষারীতির পরিবর্তন-বিবর্তন সমাজ-মানসের পরিবর্তন-ধারার বাইরে কোনো খণ্ডিত স্থলভাগে নয়, বরং তার ভেতরেই ঘটে বলে শব্দের ব্যতিক্রমী আচরণ সামাজিক অনুমোদন লাভ করে। রূপান্তরিত সমাজ-চিত্তে লালিত শব্দ তখন ভাষার নতুন সামাজিক ভূমিকা পালনে সহায়তা করে। পক্ষান্তরে কবিতায় শব্দের বিশেষ প্রয়োগ, শব্দযোজনা বা শব্দাবলীর বিশেষ সমাবেশের কৌশল কবির একান্তই ব্যক্তিগত; এবং শব্দ বা শব্দাবলীর নতুন ভাব-অর্থব্যঞ্জনায় উত্তরণ মানেই কবিচিত্তে উন্মোচিত অপূর্ব অস্তিত্বচেতনায় শব্দশরীর ধারণ। শব্দাবলী ধৃত কবির এই ব্যক্তিগত অস্তিত্বচেতনা, অন্য কথায়, কবির ব্যক্তিচৈতন্য প্রয়োগে উন্মোচিত জগৎ-জীবনের অস্তিত্বময় সত্যের ভাবসত্যে, ভাবসত্যের শব্দসত্যে, এবং শব্দসত্যের রূপময় সুরময় শব্দশিল্পসত্যে উত্তরণ যদি সমাজ-মানসকে প্রাণিত করে, নতুন সমাজ-চেতনার জন্ম দেয়, তবে শব্দের এমন ব্যতিক্রম আচরণও সমাজ-স্বীকৃতি লাভ করে, এবং 'কবিতা' নামক কবির ব্যক্তিগত শব্দবিন্যাস পরিকল্পনা বা 'শব্দ-সমাবেশ' সামাজিক সম্পদ বলে গ্রাহ্য হয়।

কবিতাকর্ম তা হলে, মানুষের জীবনঘনিষ্ঠ দ্বন্দ্বময় এবং বিবর্তনচঞ্চল সামাজিক অস্তিত্বের অভিলাষ-অভীষ্ট সিদ্ধির শর্তাদির বাইরে কোনো ব্যাখ্যাহীন বিমূর্ত কল্পলোকে কেবল দায়হীন শিল্পবিহার নয়। কবিতা কেবল পরিণাম নয়, উপায়ও। কবিতা দ্বান্দ্বিক জীবনজ্ঞান থেকে কবিতার কথন-রূপকর্ম কথিত বিষয় থেকে, কবিতার শব্দযাত্রা বা তার অভিসার-অভিযান বস্তুসত্য-ভাবসত্য থেকে, এবং সমগ্রভাবে কবিতার কাব্যিক বা শৈল্পিক বিপ্লব-বিবর্তন সামাজিক বিপ্লব-বিবর্তন থেকে ততোখানি ব্যবধানে গিয়ে, অতিক্রমণ,

অগ্রগতি, প্রসারণ ও আন্দোলনের স্বাধীনতা গ্রহণ করে মাত্র, পাখির ডানা। পাখি থেকে যতোখানি ব্যবধানে গিয়ে তা গ্রহণ করা সম্ভব মনে করে। ডানা পাখিকে ওড়ায়, না পাখি ডানাকে ওড়ায়, সে অলস দার্শনিক বিতর্ক এড়াতে হলে এই সিদ্ধান্তে না এসে উপায় নেই যে, ডানা ওড়েনা, পাখিই ওড়ে; এবং পাখি তার নিজের মুক্তির জন্যই, প্রতিকূল অনুকূল হাওয়ায় বিচিত্র ভঙ্গীতে ডানাতে ঢেউ তোলে।

বাংলাদেশের কবিতা

কবি-প্রতিভা যদি পারিপার্শ্বিক বস্তুজগৎ মণ্ডলিত এবং সমকালের, অর্থাৎ এক ঐতিহাসিক খণ্ডকালের সামাজিক অবস্থা, ও সামাজিক সম্পর্ক বিধৃত কবির সঠিক অস্তিত্ব বা সত্তার অনুসন্ধানে, আবিষ্কারে, অনুভবে ও ঘোষণায়, এবং তার সম্ভাবনাময় প্রগতিশীল বিকাশে তাৎপর্যময় প্রেরণাদানে নিয়োজিত, তবে আমাদের কবিতা সে-প্রতিভার সৃজনশীলতাকে কী-ভাবে ধারণ করছে? কবির ব্যক্তিচিত্তে অনুভূত জীবনোপলব্ধি সামাজিক সহানুভূতি ও অনুমোদন লাভের জন্য ভাষামূর্তি গ্রহণ করে, এবং সমাজচিত্তের ক্রমোত্তরণ ও বিকাশের অনুকূল বলে বিবেচিত হলে, সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর বলে তা সমাজস্বীকৃতি লাভ করে। আমাদের কবিতা সে স্বীকৃতি কী-ভাবে দাবী করছে? কবির যে আনন্দ, তা অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁর কৌতূহলের আনন্দ, অস্তিত্বকে উদ্‌ঘাটনের আবিষ্কারের এবং তাকে অনুভব উপভোগের আনন্দ, তাকে ভাষামূর্তিতে মুক্তিদানের আনন্দ, এবং প্রেরণাদানের সাফল্যলাভ, অর্থাৎ সমাজ স্বীকৃতি লাভের, এবং এভাবে সমষ্টির সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার মিলনের আনন্দ। এসব আনন্দের উৎস হিসেবে আমাদের কবিতা কতোখানি বিশ্বস্ত? আর এসব কৌতূহল এ কারণে যে, বাংলাদেশের কবিতার নিগূঢ় সামাজিক ভূমিকায় নিশ্চিন্ত আস্থা স্থাপন করতে পাঠক সমাজ বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন।

আমাদের কবিতা অবশ্য এমন চূড়ান্ত সাক্ষ্য দেয় না যে, সে সামাজিক জীবন সম্পর্ক-মুক্ত 'বিশুদ্ধ' কাব্যভাবনায় অবাধ স্ফূর্তিলাভ করতে সক্ষম হয়েছে। বস্তুতঃ কবিতা-কর্মীদের সামাজিক অবস্থান, তাঁদের নিকটতম বস্তুগত ও ভাবগত প্রভাব-বলয়, তাঁদের কবিতাকে অস্তিত্বনিষ্ঠ বা অস্তিত্ব উদাসীন কোনো কাব্যভাবনারই চূড়ান্ত সীমায় যেতে নিঃশর্ত আনুকূল্যদান করেনি। বাস্তব জীবনসজ্ঞানতা ও অলৌকিক শিল্পাদর্শের পারস্পরিক অনুরাগহীনতা, এবং একই সঙ্গে একের হাত থেকে অপরের মুক্তিলাভের স্বাভাবিক ব্যর্থতা, কবিতার বিপরীতমুখী দুটি শুভাশুভ যাত্রার সীমান্তকেই সমাজমানস-বলয়ের বিশেষ পরিধিরেখার মধ্যে সঙ্কুচিত করে রেখেছে। এই সীমারেখা দুটি অতিক্রমণের অকাল উত্তেজনাও কিছু কিছু কবিতাকে উত্তপ্ত করেছে বলে কথিত হয়েছে, কিন্তু সে উত্তাপ বাংলা কবিতার স্নায়ু-শিরায় সঞ্চারিত হয়নি। কারণ, তা ঘনীভূত হয়েছে ভারসাম্যের মধ্যবিন্দু থেকে অনেক দূরে, কোনো নির্জন খণ্ড-প্রান্তরে। তবে যে-সব কবিতায় ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটা কেন্দ্রবিন্দু স্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে, সেগুলিতে অস্তিত্বের অভীষ্ট সিদ্ধিতে কবি-ভাবনার সক্রিয় প্রয়োগের প্রতীকী কামনা আভাসিক আছে। প্রত্যাশিত সামাজিক পরিবর্তনে আরোপিত প্রতিকূলতা, সমষ্টির ক্রমমুক্তির মধ্য দিয়ে ব্যক্তির যে মুক্তি, তাকে শৃঙ্খলিত করে রেখেছে বলে, সে-সব কবিতায় সত্তার বন্দীদশার জন্য কান্না, বিলাপ, দুশ্চিন্তা, ক্ষোভ ও অনির্দিষ্ট বিরুদ্ধতার প্রতি অভিশাপ-বাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ কান্না, দুশ্চিন্তা ও ক্ষোভ স্বভাবতঃই এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তির। কেননা, সমাজ ব্যবস্থায় অবাধ অনুপ্রবেশে সক্ষম বিচ্ছিন্নতাবাদের আজন্ম শিকার সে। কেবল সমষ্টি থেকেই নয়, নিজের ভেতরেও সে বহুখণ্ডে বিচ্ছিন্ন। তার যৌবন খণ্ডিত শৈশব থেকে, বার্ধক্য খণ্ডিত যৌবন থেকে, পরিণাম খণ্ডিত প্রৌঢ়তা থেকে। অনুভব

থেকে বিশ্বাস, বিশ্বাস থেকে জ্ঞান, জ্ঞান থেকে কর্ম, কর্ম থেকে কর্মফল, স্বপ্ন থেকে সৃজনক্ষমতা অস্তিত্ব থেকে ইতিহাস, এমন কি অস্তিত্ব থেকে তার অস্তিত্বের ধারণাটিও বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতা পরস্পরের মধ্যে অপরিচয়ের ব্যবধান রচনা করেছে, এমন কি খণ্ডগুলিকে ক্রমান্বয়ে পরস্পরবিরুদ্ধও করে তুলেছে। কবিতাকর্মের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের অনুসন্ধান ও অনুভব নিঃসঙ্গ এক নিঃস্বের ভগ্নাংশ সংগ্রহে এবং সেগুলির অতৃপ্ত অনুভবেই সুতরাং ব্যয়িত। আমাদের কবিতায় তাই ব্যক্তির অতৃপ্ত যৌবন কাঁদে শৈশবছিন্ন দ্রুত পলাতক এক ছায়া-কৈশোরের জন্য, বার্ধক্য কাঁদে তার নিজেরই ঘাতক সেই বিনষ্ট যৌবনের জন্য, পূর্ণত্ব বৃথা কাঁদে প্রৌঢ়ত্বের জন্য, যে প্রৌঢ়ত্ব এখন অতিনিমগ্ন তার শৈশব-কৈশোর-যৌবনের যোগফল—এক গাণিতিক বৃত্ত অঙ্কনে। বিশ্বাস জ্ঞানবোধবিরোধী, জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে সেতুহীন বিচ্ছেদ, অস্তিত্বের ধারণা অস্তিত্বের গায়ে জড়ানো ভিন্ন-দেহীর মৃতচর্মের ছিন্ন শ্লথ আবরণ বিশেষ। ফলে আমাদের কবিতায় যন্ত্রণার কান্না-ক্ষোভ-চিৎকার, আনন্দের হাসি—প্রশান্তি-সঙ্গীত, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ উচ্চারণ অসামঞ্জস্যে বেসুরা; কবিতাকর্ম বিচিত্র জোড়াতালির দুর্ভাগ্যজনক সূচীকর্মে জটিল। কবিতা যেন কবির নিজের হাতেই রচিত তার নিয়তি। খণ্ড খণ্ড এক একটি কবিতা যেন তাঁর নিজ হাতে শব্দরত্ন-প্রস্তরে নির্মিত তাঁর নিজেরই খণ্ডিত অস্তিত্বগুলোর ভিন্ন ভিন্ন সমাধি।

জীবনের বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে ফিরে পাবার, ও চূর্ণিত সত্তার পূর্ণবয়বটিকে বোধের পরিধি-সীমায় আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষা, এবং ব্যক্তিচেতনার খণ্ডদ্বীপে দাঁড়িয়ে সমাজচেতনার মূল ভূভাগের দিকে বাহু বিস্তারের করুণ উৎকন্ঠা আমাদের কয়েকজন কবির মূল কবি-মানসে সচেতনভাবেই লালিত হয়েছে। তবে সত্তার গভীরতম বিপন্নতার রহস্য রূপায়ণে, এবং মৌলিক সঙ্কট উত্তরণে, কবিতাকে সক্রিয় করে তুলতে গিয়ে তাঁদের সমাজচেতনা ও শিল্পচেতনার অভিন্ন যৌথ প্রয়োগ বিশেষ বিশেষ পর্যায়ে এসে দ্বিধাগ্রস্ত অথবা শিথিল হয়ে পড়ায়, কবিতার পরবর্তী উত্তরণগুলো সম্ভাবিত হয়ে রয়েছে মাত্র। তবে এসব কবিতাই একই সঙ্গে আমাদের ভূমিতল এবং ভূমিতলের উর্বরতা। এখানে আপাততঃ এই বিশ্বাসে আমাদের তৃপ্ত থাকা হয়তো সমীচীন যে, সামাজিক উত্তরণকে বড়ো বেশি পশ্চাতে ফেলে কবির ব্যক্তিগত সৃজনপ্রতিভার, এবং সামগ্রিকভাবে কবিতার বিরতি-হীন ক্রমোত্তরণ সম্ভব নয়; কেননা, সমাজের মূল উত্তরণ প্রক্রিয়ায় কবিকর্ম একটি গৌণ কর্ম মাত্র। তবে এই প্রেক্ষিতে, অপূর্ণ জীবনের ব্যক্তিক ও সামাজিক পূর্ণাবয়ব গঠন-পরিকল্পনায় কবিতা তার সম্ভাব্য সক্রিয় ভূমিকা পালনে ক্ষমতাক্ষীণতায় আক্রান্ত হলেও অন্ততঃ নিষ্ক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের দায়িত্বটি সে বর্জন করেনি। বিদীর্ণ জীবনের নীলাক্ত স্মৃতি ও অমল স্বপ্নের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কবিতা সত্তার যন্ত্রণাকাতর অনুভব ও প্রতীকী ক্ষোভ-বিক্ষোভ প্রকাশে নিজেকে তৎপর রেখেছে পূর্ণত্বের প্রত্যাশায়। এই পরাভবের মধ্যে প্রচ্ছন্নতার বিনম্র সততাটির ব্যাখ্যা হয়তো। এই যে, সমষ্টির প্রতিষ্ঠার মধ্যেই ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা ও মুক্তি,—সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষত এক নিঃসঙ্গ ব্যক্তির এই অনুভবকে, এবং আত্মরক্ষা ও আত্মমুক্তির উদ্দেশ্যে সেই বৃহতের মধ্যে নিজেকে স্থাপনের আকাঙ্ক্ষায় ক্লান্ত ব্যক্তিটির যন্ত্রণা ও চিৎকারকে সে শিল্পায়িত করছে। এই সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা ও সামাজিক স্থবিরতা—অস্থিরতার সীমাচিহ্নের মধ্যে অবস্থিত দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভাবনা-চিন্তাকর্ষিত স্থানটিতে কবিতা নবজন্মের আকাঙ্ক্ষায় উর্বরতা সন্ধান করছে।

[দুই]

পক্ষান্তরে আমাদের কবিতা সামাজিক ও ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বের অভীষ্ট সংক্রান্ত মৌলিক শর্তাবলী থেকে মুক্ত ধবল বিশুদ্ধ এক শিল্পসত্য নামক সংস্কারটির প্রতি কবিমনের মোহ ও আনুগত্যকে অপ্রমাণ করেনা। ব্যক্তিজীবন সামাজিক সম্পর্কের উঞ্চতায় নিজেকে

স্পন্দিত করে নিষ্ক্রিয়তা, নিঃসঙ্গতা ও শীতলতার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভ করে। এবং ব্যক্তিগিত্তের মুক্তি মানে, অস্তিত্বের বিকাশে আনুকূল্য লাভের আকাঙক্ষায় সামাজিক অর্থাৎ মানবিক সম্পর্কের গভীরতার ভেতরে উষ্ণতম সংস্পর্শতায় উজ্জীবিত হয়ে ক্রমসক্রিয় হয়ে ওঠার সুযোগ। খণ্ডিত সমাজে মানবিক সম্পর্কের স্বাভাবিক গ্রন্থিগুলো ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন ; মানবিক মূল্যবোধগুলো অসংলগ্ন, এমন কি নিষ্ঠুরভাবে পরস্পরবিরুদ্ধ। আমাদের কবিতায় স্বাভাবিক মানবিক সম্পর্কের উষ্ণতার গভীরে নিমজ্জনের আকাঙক্ষার কথা, প্রতিকূলতা অতিক্রমণের অপরিহার্যতার কথা, সংঘর্ষজনিত রক্তক্ষরণের, যন্ত্রণার, ব্যর্থতার, হতাশার, অবিশ্বাসের কথা, ক্ষোভের, বিক্ষোভের, বিমূঢ়তার কথা, স্ফুট-অস্ফুট-প্রতীকী কণ্ঠে উচ্চারিত আছে। সে উচ্চারণে ভাষাগত, শিল্পগত স্থূল-সূক্ষ্ম নৈপুণ্য প্রদর্শনের প্রচেষ্টাও সাক্ষরিত আছে। কবির শিল্পীসত্তা এবং ব্যক্তিসত্তার অভিন্নতাবোধ এখানে অস্বীকৃত নয়। প্রকৃতপক্ষে, ব্যক্তিনিরপেক্ষ শিল্পীসত্তার কোনো অস্তিত্ব নেই। শিল্পক্রিয়া ব্যক্তির স্বকীয় ও সামাজিক অস্তিত্বের উপলব্ধিসমূহকে অস্তিত্বের মৌলিক অভীষ্টসিদ্ধির পরিকল্পনা অনুযায়ী সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যপূর্ণ রূপান্তরণের প্রক্রিয়া বিশেষ। এ প্রক্রিয়া-পদ্ধতি অবশ্যই ব্যক্তির জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত অস্তিত্ববোধ প্রকাশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কিন্তু আমাদের কবিতা 'কবিসত্তা ব্যক্তিসত্তা নিরপেক্ষ', এমন ধারণার আশ্রয়েও লালিত-বর্ধিত-বর্ণাঢ্য হবার চেষ্টাও কম করেনি। এসব কবিতা সামাজিক মানুষ হিসেবে কবির ব্যক্তিসত্তা থেকে কল্পিত কবিসত্তাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখার প্রয়াসেরই সাক্ষ্য দেয়না, কবির এধারণাকেও মূর্ত করে তুলতে চায় যে, উভয় সত্তা পরস্পর চিরকালের প্রতিপক্ষ হিসেবে সর্বদা পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত। এই ভ্রান্ত দ্বন্দ্বে বাস্তব বিজয়লাভ সম্ভব না হলেও, স্বঘোষিত কাল্পনিক এক প্রকারের বিজয়ের স্বাদ অনুভব করে নেয়া যেতে পারে ; কারণ, ব্যক্তিসত্তার বন্ধনে আবদ্ধ বলে কথিত সেই স্বয়ংসিদ্ধ কবিসত্তাকে বন্দীদশা থেকে মুক্তি ও নির্ঝঞ্ঝাট নিরা-পত্তা দানের নিমিত্তে, মূল জীবনদ্বন্দ্বের বাইরে শূন্যালোকে আয়োজিত এ এক কল্পনা প্ররোচিত দ্বন্দ্ব মাত্র। আসলে, কবি যখন তার ব্যক্তিগত অস্তিত্বের মুক্তির জন্য অস্তিত্বের মৌলিক অভীপ্সাগুলোকে সমষ্টিগত জীবন সম্পর্কের উষ্ণতম গভীরতায় এবং সেই সম্পর্কের আলোকে উদ্ভাসিত প্রকৃতিজগতের অচলতায় সঞ্চালিত করতে ব্যর্থ হন, অক্ষম হন, প্রতিভা ও শ্রম ব্যবহারে অলস বা অনিচ্ছুক থাকেন, অথবা শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগত-ভাবে প্রাপ্ত বা অধিকৃত আপাতঃ সুবিধাজনক অবস্থানটি তাঁকে সে-সব প্রয়োজনবোধের প্রতি অনীহা প্রকাশে সক্রিয় উৎসাহ যোগায়, তখন সহজ আত্মমুক্তি ও প্রসারতা লাভের এবং শিল্পক্রিয়ায় সৃজনশীল হয়ে ওঠার বিকল্প উপায় হিসেবে তিনি মানবজগৎ ও বস্তুজগৎ নিরপেক্ষ নিঃসীম কল্পলোকের রহস্যাভিযানে অবাধে উড্ডয়নসক্ষম শিল্পী-সত্তা নামক রূপকথার এক স্বর্ণবিহঙ্গের ডানায় রেশমলঘু পালকাসন বাসনা করেন। তাঁর ধারণা, জরা-ব্যাধিবন্দী মরণশীল স্থূল ব্যক্তিটির চরণযুগল কালের কর্দমবস্তুতে প্রোথিত, এবং ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তির জন্য সে শ্রমকর্ষিত ভূমিতে শস্য দানা ও মাটির গভীরতা থেকে খননে উত্তোলিত পানীয় দাবী করে ; কিন্তু শিল্পী জরা-ব্যাধি-মৃত্যুর স্পর্শতামুক্ত ; সে তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কেবল আকাশে ছিটানো হলুদ নক্ষত্রের দানা এবং আকাশের সুগোল চন্দ্রকূপ থেকে স্বতঃক্ষরিত ফেনিল জোৎস্নামৃত দাবী করে। এমন ধারণার আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা কবিতাবলী সাধারণতঃ তাদের স্রষ্টার স্বেচ্ছাচারিতারই অসহায় শিকারে পরিণত হয়। বাংলাদেশের কবিতার ক্ষেত্রে এই স্বেচ্ছাচারিতা অমল বিমূর্ততার পথে অনিবার্য কারণে এগোয়নি। এগিয়ে যাবার প্রেরণা প্রধূমিত হয়েছিল, কিন্তু প্রেরণাটি অতিকৃত্রিম বর্ণোজ্জল দূষিত রক্তে মুখমণ্ডলাংশে মাত্র হঠাৎ ফুলে ওঠা সমাজের পুঁজ-রক্তামৃত পানের উৎসব-কোলাহলের প্রভাবে একটি স্নায়বিক উত্তেজনায় পর্যবসিত হওয়ায় এবং স্বভাবসিদ্ধভাবে তা নিকটতর চতুর নগর, নাগর ও নারীদেহমাংসকেন্দ্রিক হয়ে পড়ায়, এবং অচিরেই সমাজের সামগ্রিক পরিবেশ-পরিস্থিতি, রাজনৈতিক

ঘটনা-প্রবাহ ও সামাজিক ইতিহাসের অমোঘ প্রয়োজনাদি এমন উত্তেজনার ওপর শৈত্য নিক্ষেপ করায়, অর্থাৎ সামাজিক মুক্তির প্রশ্ন স্পষ্টতর ও ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হয়ে ওঠায়, বিশুদ্ধতার সেই সুদূর অভিসার বিড়ম্বিত হয়েছে। বস্তুতঃ দেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী প্রখরতর সামাজিক দ্বন্দ্ব, অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার আবর্তে পড়ে, সমষ্টিগত জীবন ও ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণাময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারায়, প্রায় সকল কবিকেই, কবিতার সামাজিক, অর্থাৎ তার নিজস্ব মৌলিক ভূমিকার গুরুত্বকে বেশি করে গ্রাহ্য করতে হয়েছে। কবিতায় তাঁদের এই অভিজ্ঞতা অবশ্য বহুতর ক্ষেত্রেই সমাজচেতনার গভীরতর ধারায় মিশ্রিত না হয়ে, তা খণ্ডিত ভাব-প্রবণতায়, উপর অনুষঙ্গত শাব্দিক চাতুর্যে, অথবা কেবল আনুষ্ঠানিক ও তাৎক্ষণিক মনোযোগিতায় ব্যবহৃত হয়েছে। তবে সারাংশে স্বীকার করতেই হবে যে, সমাজবিবর্তন নিরপেক্ষ অলৌকিক শিল্পবিবর্তন প্রচেষ্টা শ্রেণীর ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পৃষ্ঠপোষকতা সত্ত্বেও অন্ধকারে একটি বৃত্তের মধ্যেই স্বর্ণকীটের সন্নিজটিল তন্তুজাল রচনায় নিঃশেষিত হয় মাত্র, কবিতার ভুবনে এ-বোধও সুস্পষ্ট সংক্রমিত হয়েছে, এবং এ উপলব্ধি কেবল তত্ত্ববদ্ধ ও নিষ্ফলা হয়ে থাকতে চাইছে না। সুতরাং আমরা উদ্দীপ্ত হয়ে উঠি যখন দেখি, আমাদের কবিতা সামাজিক মানুষের এবং সামাজিক ব্যক্তি হিসেবে কবির ব্যক্তিগত অস্তিত্বের ওপর প্রতিকূল শক্তি সমূহের আঘাতের যন্ত্রণা এবং যন্ত্রণা উৎসারিত চেতনাবিচ্ছুরণকে, বা তার সাধারণ বিবরণকে ধরে রাখার প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু স্তিমিতপ্রভ হই তখন, যখন দেখি, সেই বিচ্ছুরণকে সমষ্টির অস্তিত্বের অভীপ্সার অনুকূলে একটি স্থায়ী লক্ষ্যমুখী ও উপযোগী সৃজনশক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে সে ক্লান্তি বা দ্বিধাবোধ করছে। অথবা, তা দিয়ে সে বহু আলোকিত বস্তুসত্য ও বহুচর্চিত ভাবসত্যের চেনা মুখাবয়বকে কেবল পুনরালোকিত করছে; অস্তিত্বের নতুন সত্যকে উদ্ঘাটন ও সেই সত্যকে প্রাণবীজ হিসেবে নিজের মধ্যে ধারণ করে নিজেকে সে প্রেরণা-ব্যঞ্জনাময় শিল্পসত্যে রূপান্তরিত করে উঠতে পারছে না।